ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উত্থান :-

মধ্যযুগের ইউরোপে ক্যারোলিনজীয় সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর থেকেই সেখানকার অর্থ - সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক পরিবর্তনের সূচনা হয়। নবম শতকে ইউরোপে কেন্দ্রীয় শক্তির অবর্তমানে অসহায় সাধারন মানুষদের জীবন রক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোন শক্তির শরনাপন্ন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই সময় পর্বে ভাইকিং, স্যারাসেন, ম্যাগিয়ারদের আক্রমনে ইউরোপ ব্যাপক বিপর্যস্ত হয়। অর্থ - সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি বিশেষ আহত হয়। এর ফলে জমির মালিকানা, সামাজিক শ্রেনিবিন্যাস, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ইত্যাদী পরিচালিত হতে শুরু হয় বেসরকারী ভাবে, একান্ত ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক চুক্তির ভিত্তিতে। একাদশ শতকেও ঐ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। সবচেয়ে বড়ো কথা হল এই সময় ঐ প্রক্রিয়ার কাঠামো আরও সুগঠিত হতে থাকে। একজন আঞ্চলিক কর্তৃত্বের অধিকারী বা লর্ড যখন নিজ শক্তি ~~সুসংহত~~ সুসংহত ও শক্তিশালী ভাবে গড়ে তোলেন তখন তার প্রতিবেশী অন্যান্য লর্ডরাও নিজ নিজ সুরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং গড়ে তোলেন নিজ নিজ প্রাধান্যের ক্ষেত্র। এই প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী ~~করে তোলে~~ ও অনিবার্য করে তোলে অসংখ্য বিধি-বিধান, প্রথা - প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা। এগুলির মাধ্যমে সমাজের অধিকাংশ ~~মানুষ~~ স্বাধীন ও সাধারন মানুষ হাতে গোনা কয়েকজন শক্তিশালী লর্ডদের প্রতি আজীবন আনুগত্য ও সেবার অঙ্গীকার করতে একরকম ~~বাধ্য~~ বাধ্য হয়। তবে অপরদিকে ~~লর্ডরাও~~ এই আনুগত্য ও সেবার পরিপ্রেক্ষিতে অসহায়, সাধারন মানুষদের সর্বোতভাবে রক্ষা করা ও তাদের জীবিকা নির্বাহ এর ব্যবস্থা করা লর্ডদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে স্বীকার্য হয়। এই ভাবেই মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থায় এক নতুন কাঠামোর জন্ম হয়, যাকে বলা হয় সামন্ততন্ত্র বা feudalism

feudalism শব্দটির feuda বা ফিফ নির্ভর এমন কিছু প্রথা প্রতিষ্ঠান ~~ওতপ্রোত~~ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায় যেগুলির উৎস 'ভ্যাসালেজ' নামে একান্ত-ব্যক্তিগত সম্পর্ক। নবম-দশম শতকের ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যের মধ্যে, পশ্চিম-ইউরোপের প্রায় সর্বত্র, অসহায়, দুর্বল মানুষকে নিরাপত্তার জন্য, তার-জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা খাতিরে প্রতিবেশী কোন শক্তিশালী ব্যক্তি বা লর্ডএর কাছে আত্মসমর্পন করতে হতো। এই আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার জন্য তারা তাদের ক্ষেত-খামার এর মালিকানা উপস্বত্ব ভোগের শর্তে আশ্রয়দাতার হাতে তুলে দিত। এই আশ্রয় দাতা ~~ব~~ প্রভু বা লর্ড শরনাগতের কাছ থেকে

খাজনা (শস্য) ও সেবা পাওয়ার অধিকারী হতেন। এই ব্যবস্থা পরিচিত হয় বেনিফিস নামে, কেননা লর্ড তার আশ্রিতকে জমি ব্যবহারের benifit বা সুফল ভোগ করতে দিতেন। এই জোরেই ইউরোপে 'ফিফ্' এর মাধ্যমে বন্দোবস্ত করা জমিতে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয়। এই ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের খন্ডিত অংশগুলিতে, ইতালী ও ইংল্যান্ডে, খ্রিষ্টান শাসনাধীন স্পেন-এ, নিকট প্রাচ্যের লাতিন প্রিন্সিপ্যালিটিগুলিতে, তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে চালু হয় এবং তার অভিঘাতে রূপান্তর ঘটে প্রশাসনিক কাঠামোর।

ঐতিহাসিক পোস্টান (M.M. Postan) Feudalism কে শুধু মাত্র সামরিক সেবা এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে রাজী নন। তিনি মনে করেন এর ফলে মধ্যযুগীয় সমাজের মৌলিক অসংখ্য উপাদানের জন্ম ও বিকাশের কাহিনী অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং বহু সামাজিক বাস্তবতা চাপা পড়ে যায়। ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখ এর মতে, যে সমাজকে সামন্ততান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া হয় সেখানে জমির উপর ক্রমশ নীচের থেকে উপরের দিকে বিন্যস্ত অধিকার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি, বিকাশ ও চরিত্রের বিশ্লেষণ বিষয়ে এবং তার রীতি নীতি গুলির তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে পন্ডিতদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। তবে সামন্ততন্ত্র যে আদিম, প্রাচীন ও জীর্ণ হয়ে যাওয়া উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাতের পরিনাম হিসাবে মধ্যযুগীয় ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা ছিল স্বতঃই প্রমানিত। সুতরাং সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো-গঠনে রোমান ও জার্মান উপাদানের যে সংমিশ্রন ঘটেছিল তা ছিল সত্য ও স্পষ্ট।

৮৪৩ খ্রি: ভের্দুনের চুক্তির পর থেকে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ইউরোপে। মার্ক ব্লখ ও এফ. গ্যানসফ উভয়েই বলেছেন যে, দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী ছিল সামন্ততন্ত্রের Classical Age (ক্লাসিক্যাল এজ)। এই সময় ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হয়। একাদশ শতকে ম্যানর প্রথায় ছেয়ে গিয়েছিল ইউরোপে। সামন্ততন্ত্রের উত্থানের সাথে সাথে দুর্বল হতে শুরু করেছিল রাজশক্তি,

৫ সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

সামন্ততন্ত্র হল এমন একটি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিকাঠামো, যা বিশেষ ধরনের ভূমি ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত ছিল।

সামন্ততন্ত্রের সাধারন সংজ্ঞার ভিত্তিতে এ কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্নিত হল -

প্রথমতঃ সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ছিলেন রাজা এবং তার নীচে ছিলেন ভূ-স্বামী শ্রেনী। ভূ-স্বামীদের মধ্যে উচ্চ-নীচ স্তর বিন্যাস ছিল। সম্পত্তির অনুপাতে তাদের ক্ষমতার স্তর বিন্যাস ছিল। রাজার নিম্নে ছিলেন ডিউক, কাউন্ট প্রভৃতি ভূ-স্বামী। এদের নীচে ছিল ব্যারন ও ভাইকাউন্ট এবং সর্বনিম্নে ছিল নাইট। এ সমস্ত সামন্ত প্রভুদের নিজস্ব দুর্গ এবং আত্মরক্ষার জন্য অথবা কৃষক বিদ্রোহ-দমনের জন্য উপযুক্ত সেনাবাহিনী পালন করতে হত। রাষ্ট্রের সাথে ভূ-স্বামীদের চুক্তি সম্পর্ক ছিল। একটি নির্দিষ্ট এলাকার জমির উপরেও ভূ-স্বামী শ্রেনীর প্রাধান্য ছিল। এককথায় বলা যায় একটি নির্দিষ্ট এলাকায় শাসন, বিচার ও জমির উপর ভূ-স্বামীর সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল।

দ্বিতীয়তঃ সামন্ততন্ত্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল ম্যানর প্রথা। ভূ-স্বামীর এলাকা যুক্ত জায়গাকে বলা হত ম্যানর। ঐ এলাকার মধ্যস্থলে ভূ-স্বামীর বাড়ি বা দুর্গ থাকত। এবং চারপাশে শাকসব্জী ও ফলমূলের বাগান থাকত। খুব কাছেই থাকত ভূ-স্বামীর পরিচারিকাদের গৃহ। প্রতিটি ম্যানরে সংশ্লিষ্ট গ্রামের অধিবাসীরা শস্য উৎপাদন করত। তাদের অনেকেই সামন্ত প্রভুর জমিতে চাষ-আবাদ করত। কিংবা অনেক সময় স্বাধীন ভাবে চাষআবাদ করলেও তার বেশীর ভাগ অংশ সামন্ত প্রভুকে কর হিসাবে দিতে হত।

তৃতীয়তঃ সামন্ততন্ত্রের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক দ্বিমুখী বিভাজন। অর্থাৎ সমাজে সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাস এই দুই শ্রেনীর অস্তিত্ব ছিল। কোন বিশেষ অঞ্চলের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে সামন্ত প্রভুর খাস জমি থাকত। ঐ জমিতে কৃষকেরা বা ভূমিদাসরা শ্রম দানে বাধ্য থাকত। এর বিনিময়ে কৃষকদের বা ভূমিদাসদের কোন রকম পারিশ্রমিক দেওয়া হত না। অর্থাৎ দাস সমাজের মত ভূমিদাসরা ছিলেন সামন্ত প্রভুদের সম্পত্তি, তাদের স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম করার কোন অধিকার ছিল না।

চতুর্থতঃ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরিচালিত হত। প্রতিটি ভূ-স্বামীর এলাকা অর্থাৎ ম্যানর ছিল স্বাবলম্বী ও স্ব-পর্যাপ্ত। ম্যানরের প্রয়োজনীয় চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই কৃষি ও শিল্প পরিচালিত হত। অর্থাৎ শিল্পজাত দ্রব্যাদি কারিগররাই তৈরী করত। সামন্ত প্রভু কিংবা কৃষক বাইরের আমদানী জিনিস কমই ব্যবহার করত।

পঞ্চমতঃ সামন্ততন্ত্রের আমলে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বিদ্যা ও শ্রম বিভাজন প্রক্রিয়া অনুন্নত ছিল। তৎকালীন সমাজে বিজ্ঞান চিন্তার বিশেষ অবকাশ ছিল না। ফলে প্রযুক্তি বিদ্যা ছিল নিম্নমানের। উৎপাদনী উপকরণ গুলি ছিল সহজ সরল ও কমদামী। এছাড়া উৎপাদন প্রক্রিয়া ছিল অনেকটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক, যেহেতু উৎপাদিত সামগ্রী বাইরে রপ্তানীর কোন ব্যবস্থা ছিল না, সেহেতু এই ব্যক্তি প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা দ্রব্যাদি উৎপাদন করত। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শ্রম বিভাজন ছিল খুবই অনুন্নত।

ষষ্ঠতঃ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সম্পত্তির ক্রম বিন্যাস। এই সমাজে - সম্পত্তি বেচাকেনা সহজ সাধ্য ছিলনা, ভূমি বা সম্পত্তি পত্তনি দেওয়ার প্রথা ছিল। ফলে সম্পত্তি স্তর বিন্যাস হয় এবং গ্রামীন স্তরে সামন্ত প্রভুর খাস জমি ও চাষীর জমি বিদ্য-মান থাকে অর্থাৎ পত্তনি ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীন বা সর্বনিম্ন স্তরে সামন্ত প্রভুরাই জমির মালিকানা, উৎপাদন পদ্ধতি এবং সমাজ জীবনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠত।

সর্বোপরি : সামন্ততান্ত্রিক সমাজে চার্চের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই চার্চ প্রধান অঙ্গ ছিল। চার্চ ছিল সকলের সেরা ভূ-স্বামী। চার্চ রাজা ও সামন্ত প্রভু কর্তৃক ভূমিদানের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারী হয়ে উঠত। 1035 খ্রীঃ কনরার্ড কর্তৃক একটি রাজকীয় দান এর সাক্ষ্য বহন করে। এ দানপত্র থেকে জানা যায় যে রাজা কনরার্ড খাসভূমি, আবাদী ও অনাবাদী জমি, দাসজন ভূমিসহ ৪টি গ্রাম দান করেছিলেন। চার্চ, সামন্ত জমিদারদের মতই সাধারন কৃষক-কে চূড়ান্ত ভাবে শোষন করত। টাইথ, ভূমিকর এমনকি কর্ভি বা বাধ্যতা-মূলক শ্রম দানের দ্বারা চার্চ, কৃষকদের উৎপাদন নিজেদের নিয়ন্ত্রনে এনেছিল।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা-র মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি যথেষ্ট সবল ছিল। সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গুলি থেকে বলা যায় যে, এ ধরনের পরিকাঠামো সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সমগ্র সমাজকে দুটি স্তরে বিভাজিত করে ছিল। একদিকে ছিল ধনবান ও ক্ষমতাশালী অভিজাত শ্রেনী এবং অপর দিকে ছিল শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত কৃষক বা ভূমিদাস। এই ধরনের ব্যবস্থা একদিকে যেমন উৎপাদন ও ব্যবসা বানিজ্যের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে তেমনি সংখ্যা গরিষ্ঠ মনুষ্যের দাসত্ব, মানুষের চিন্তাধারা ও বিজ্ঞান চেতনার পথকে রুদ্ধ করেছিল।

Sinha